Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

জাদুবাস্তবতা ও রবিশংকর বলের উপন্যাস চতুষ্টয়

দিব্যেন্দু সরকার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/7_Dibyendu-Sarkar.pdf

সারসংক্ষেপ: আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম রীতি জাদুবাস্তব কথন। জার্মান চিত্রকলার জগতে প্রথম এই ধারার উদ্ভব হলেও একাধিক লাতিন আমেরিকান লেখকের হাত ধরে জাদুবাস্তব ধারার সাহিত্য রচনা রবিশংকরের সর্বাধিক। আর সমালোচক হিসেবে রবিশংকরও লাতিন আমেরিকান তথা কলম্বিয়ান লেখক মার্কেসের লেখা প্রসঙ্গে জাদুবাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেছেন 'বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব' প্রবন্ধে। আমাদের আলোচ্য রবিশংকরের কিছু উপন্যাসে এই জাদুবাস্তব কথন কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। Franz Roh থেকে Alego Carpentier হয়ে Marquez পর্যন্ত বিবিধজনের জাদুবাস্তবতা সংক্রান্ত মত কতদূর রবিশংকর বলের রচনায় প্রযুক্ত হয়েছে সেটাই বিবেচ্য। জাদুবাস্তব রচনার অন্যতম উপাদান 'Hallucinatory scenes and events' রবিশংকরের 'দোজখনামা', 'আয়না জীবন', 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে', 'জিরো আওয়ার'-সহ বেশ কিছু রচনায় স্পষ্ট ব্যবহৃত। জাদু-দুনিয়ার উপাদান আর রূঢ় বাস্তব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই মিলেমিশে আছে এইসব রচনায়। জাদুবাস্তব রচনার আরো অন্য উপাদান যথা, 'heteroglossia', 'cross-culturalism', 'postcolonialism' ইত্যাদি বিষয়গুলি লক্ষ করা যায় রবিশংকরের রচনায়। আর এইসব নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি ভাঙতে চেয়েছেন প্রচলিত ইউরোপীয় প্লট সর্বস্ব কাহিনি রচনার রীতিকে। কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে কিস্‌সা, দাস্তানের রীতিকে অনুসরণ করে তিনি পাঠককে নিয়ে চলেন অনিঃশেষ গল্পের যাত্রী করে।

সূচক শব্দ: জাদুবাস্তবতা, Franz Roh, Marquez, 'Hallucinatory scenes and events', 'দোজখনামা', 'আয়নার জীবন', 'জালালুদ্দিলুদ্দিন' রুমি, 'diaspora'

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের গল্পে জাদুবাস্তবতার ব্যবহার প্রসঙ্গে রবিশংকর বল 'বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব' প্রবন্ধে লিখেছেন — "বাস্তবতা সেই বিমানপোত, যেখানে দৌড়তে দৌড়তে শুরু হয় উড়াল। এই বাস্তবতা যেমন দৈনন্দিনের বেঁচে থাকার, তেমনই তাঁর স্বদেশেরও, শুধু কলম্বিয়া নয়, গোটা দক্ষিণ আমেরিকা ওরফে আমেরিকার। সারা লাতিন আমেরিকা জুড়ে একের-পর-এক সামরিক শাসন, একনায়কতন্ত্রের নির্মম, রক্তাক্ত বাস্তবতার ভিতরে দাঁড়িয়ে মার্কেসের গল্পের উড়াল। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা-ই হোক কিংবা আমার অন্য যে কোনো বইই হোক, আমার লেখার প্রতিটি পঙ্‌ক্তির যাত্রাভূমি নিখাদ বাস্তব থেকে, আমি শুধু একটা আতসকাচ দিই, যাতে পাঠক বাস্তবকে ভালভাবে বুঝে নিতে পারে... '।"[১] রবিশংকর নিজেও কী তাঁর বেশকিছু রচনার মধ্য দিয়ে পাঠককে একটা আতসকাচ দেন না? তার মধ্য দিয়ে আমরাও কী দেখতে পাই না দৈনন্দিন বেঁচে থাকার বাস্তবতাকে, তাঁর কালের দেশজ আর আন্তর্জাতিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক টানাপোড়েনকে? রবিশংকরের অধিকাংশ লেখার যাত্রাও বাস্তবের রক্তাক্ত ভূমি থেকে। তাহলে কী রবিশংকরের লেখাতেও প্রযুক্ত হয়েছে জাদুবাস্তবতা।

জাদুবাস্তবতা কাকে বলে? জাদু দুনিয়ার কিছু উপাদান আর নির্মম বাস্তব জগৎ গাঁটছড়া বেঁধে থাকে যেখানে সেখানেই নির্মিত হয় জাদুবাস্তবতা। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মান সমালোচক Franz Roh শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। সাহিত্য নয়, জার্মান চিত্রকলার জগতে প্রথম এই আন্দোলনটির সূত্রপাত। Roh জানিয়েছিলেন —

"with the word 'magic', as opposed to 'mystic', I wished to indicate that the mystery does not descend to the represented world, but rather hides and palpitates behind it."[২] বোঝাই যাচ্ছে জাদু দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য নয়, জাদুবাস্তবতায় প্রাধান্য পায় বাস্তব পৃথিবীর জীবনধারা।

সাহিত্যজগতে জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ নানাজনের হাত ধরে। জার্মান সাহিত্যে ফ্রান্‌জ্ কাফ্‌কার লেখায় দেখা যায় জাদুবাস্তবতার ব্যবহার। আবার লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে অ্যালেজো কার্পেন্টার (Alejo Carpentier), মার্কেজ (Marquez) প্রমুখের রচনায় লক্ষ করা যায় জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদে বা ইতালীয় লেখক ইতালো কালভিনোর রচনাতেও দেখা যায় জাদুবাস্তব কথনরীতির ব্যবহার। লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ জার্মান শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় একটু পরে — বিংশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কার্পেন্টার লিখছেন "On the Marvelous Real in America' প্রবন্ধখানি। প্রবন্ধে তিনি লিখছেন — "I will say that my first inkling of the marvelous real [lo real maravilloso] came to me when, near the end of 1943, I was lucky enough to visit Henri Christopher`s kingdom – such poetic ruins".[৩] এই প্রবন্ধেই তিনি আরো লিখেছেন —

"The marvelous real is found at every stage in the lives of men who inscribed dates in the history of the continent and who left the names that we still cary: from those who searched for the fountain of eternal youth and the golden city of Manoa to certain early rebels or modern heroes of mythological fame from our wars of independence, such as Colonel Juana de Azurduy."[৪]

লাতিন আমেরিকার মানুষদের বেঁচে থাকার, বাঁচার লড়াইয়ে রূঢ় সত্য থেকে উঠে এসেছে জাদুবাস্তবতা। আর লাতিন আমেরিকায় জাদুবাস্তব সাহিত্য সর্বাধিক বিকশিত হয় গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের হাতে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান 'One Hundred Years of Solitude' গ্রন্থটির জন্য। এই নোবেল পুরস্কার গ্রহণের অনুষ্ঠানে মার্কেস বলেন — "On a day like today, my master William Faulkner said, 'I decline to accept the end of man'. I would fall unworthy of sanding in this place that was his, if I were not fully aware that the colossal tragedy he refused to recognize thirty two years ago is now, for the first time since the beginning of humanity, nothing more than a simple scientific possibility. Faced with this awesome reality that must have seemed a mare utopia through all of human time, we, the inventors of tales, who will believe anything, fell entitled to believe that it is not yet too late to engage in the creation of the opposite utopia. A new and sweeping utopia of life, where no one will be able to decide for others how they die, where love will prove true and happiness be possible, and where the races condemned to one hundred years of solitude will have, at last and forever, a second opportunity on earth."[৫]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক আর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে লাতিন আমেরিকান সাহিত্যে প্রযুক্ত হয় জাদুবাস্তবতা। আর মার্কেজের বক্তব্য অনুসারে জাদুবাস্তব কথনের মধ্য দিয়ে লেখক পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরবেন — "A new sweeping utopia of life"কে। যেখানে ভালোবাসা সত্য প্রমাণিত হবে, জীবনে প্রশান্তি সম্ভবপর।

জাদুবাস্তব সাহিত্যের স্বরূপ ঠিক কেমন হবে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'Magical Realism' গ্রন্থের ভূমিকায় Lois Parkinson Zamora এবং Wendy B. Faris সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন — "Magical realist texts are subversive: their in-betweenness, their all-at-onceness encourages resistance to monologic political and cultural structures, a feature that has made the mode particularly useful to writers in postcolonial and, increasingly, to women. Hallucinatory scenes and events, fantastic / phantasmagoric characters are used in several of the magical realist work discussed here to indicate recent political and cultural perversions."[৬]

অর্থাৎ জাদুবাস্তববাদ উত্তর উপনিবেশিক রচনাকারদের কাছে খুবই উপযোগী এক রচনারীতি। জাদুবাস্তববাদি রচনা ধ্বংসাত্মক। তা একঘেয়ে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। এই ধরনের রচনায় ভ্রমাত্মক ঘটনা এবং দৃশ্য (‘Hallucinatory scenes and events’) যেমন থাকে, তেমনি থাকে রূপকথার বা মিথিক্যাল দুনিয়ার চরিত্রদের অথবা ‘phantasmagoric’ চরিত্রের উপস্থিতি। এই চরিত্রগুলি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লেখক জাদুবাস্তববাদি রচনায় বর্তমানের তথা বাস্তবের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিচ্যুতিকে চিহ্নিত করবেন। শব্দটির বাংলা করা যেতে পারে — স্বপ্নের ভিতর বা মোহাবিষ্ট চোখে দেখা ছায়ামূর্তি বা কল্পিত মূর্তির ধারাপ্রবাহ।

আবার জাদুবাস্তবতা কী এই প্রসঙ্গে Maggie Ann Bowers তাঁর ‘Magic(al) Realism’ গ্রন্থে লিখেছেন — “When referring to magical realism as a narrative mode, it is essential to consider the relationship of ‘magical’ to ‘realism’ as it is understood in literary terms.”[৭] ‘Magic’ আর ‘Realism’ এর মধ্যে সম্পর্কটা কেমন সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন — “Conjuring ‘magic’ is brought about by tricks that give the illusion that something extraordinary has happened, whereas in magic(al) realism it is assumed that something extraordinary really has happened”.[৮] সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে উপন্যাসে জাদুবাস্তব কথনের মধ্য দিয়ে লেখক এমন এক বাস্তব নির্মাণ করেন, যে বাস্তবের মধ্যে থাকা জাদু উপাদানগুলিকেও বাস্তবের অঙ্গীভূত বলে মনে হয়। জাদু উপাদান গুলো এখানে তার জাদু ধর্ম নিয়ে হাজির হয় না। হারায় নিজেদের জাদু গুণ (quality)। আর বাস্তব জীবনেই কোনো না কোনো ভাবে হয়ে যায় ইচ্ছে-পূরণ।

এখন দেখার বিষয় রবিশংকর বলের কথাসাহিত্যে আদৌ কী জাদুবাস্তবতা প্রযুক্ত হয়েছে? এই মুহূর্তে রবিশংকর বলের সর্বাধিক চর্চিত এবং পাঠক মহলে পরিচিত উপন্যাস ‘দোজখ্‌নামা’। উপন্যাসের কাহিনির কথক একাধিক। কাহিনির শুরুতে লেখকই কথক। পরে কখনো ঐতিহাসিক মির্জা গালিব, কখনো আবার ঐতিহাসিক সদত হসন মন্টো[৯] হয়েছেন কাহিনি-কথক। উপন্যাসের কাহিনি-কথক তথা লেখক-কথক শুরুতেই পাঠককুলকে জানান তাঁর জীবনে ব্যাখ্যাতীত কিছু ঘটনা কখনো সখনো এসে হানা দিয়েছে। বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে থাকা সেইসব ঘটনা বাস্তব যুক্তি-বুদ্ধির অতীত। বিষয়টি পাঠককুলের বোধগম্যতার প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন — “একদিন রাস্তায় এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে আপনি যদি এমন কাউকে দেখে ফেলেন, যাকে চিত্রে বা স্বপ্নে দেখা যায়, হয়তো একটি মুহূর্তের জন্য মুখোমুখিও দেখা হয়ে যেতে পারে, তবে কী মনে হবে আপনার? মনে হবে না, এক আশ্চর্য দরজা খুলে গেছে আপনার সামনে?”[১০] বক্তব্যটির মধ্য দিয়ে রবিশংকর কী ‘Hallucinatory scenes and events’ প্রতি ইঙ্গিত করতে চাইছেন না? যদিও রবিশংকর এইসব ঘটনাসমূহ আর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে শুধু বর্তমানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক pervertions কে তুলে ধরেননি। ভারতবর্ষের প্রায় একশ বছরের এক ঐতিহাসিক সময়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক pervertion কে তুলে ধরেছেন তিনি। মার্কেজও কিন্তু তাঁর জাদুবাস্তব লেখা ‘One Hundred Years of Solitude’ এ তুলে ধরেছেন একশ বছরের নিঃসঙ্গতার আখ্যান। যদিও মার্কেজের আখ্যান আর রবিশংকরের আখ্যান আলাদা সময়ের, আলাদা বিষয়ের কথা বলে।

‘দোজখনামা’য় রবিশংকর তথা লেখক-কথক প্রথমেই যে ‘Hallucinatory’ ঘটনার কথা বলেন তা হলো — একবার লখনউতে গিয়েছিলেন লেখক-কথক তবায়েফদের নিয়ে লেখার খোঁজে। তাদের নিয়ে নানা মানুষের মুখে (যেমন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী পরভিন তালহার প্রমুখ) গল্প শুনতে শুনতে তিনি গিয়ে পৌঁছান ফরিদ মিঞার কাছে। সদত হসন মন্টোর লেখা এক বিচিত্র দাস্তানের পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে তুলে দেন ফরিদ মিঞা। মির্জা গালিবকে নিয়ে লেখা এই উপন্যসটি ফরিদ মিঞা পেয়েছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। বাবা কোথা থেকে পেয়েছেন তার সন্ধান জানা নেই কারো। ফরিদ মিঞা দাস্তানটি ছাপার জন্য অনুরোধ করেন লেখক-কথককে। লেখাটি নিয়ে লেখক-কথকের বক্তব্য “মির্জা গালিবকে নিয়ে লেখা মান্টোর অপ্রকাশিত উপন্যাস,

আসল কী নকল আমরা কেউই জানি না, আমার সঙ্গো এই শহরে এসে পৌঁছল। উর্দু জানি না, তাই এমনি এমনি মাঝে মাঝে পাণ্ডুলিপিটা দেখি। সত্যিই মান্টোর লেখা, না অন্য কারোর? তারপর একদিন মনে হল, আমরা সবাই যদি কারোর দেখা স্বপ্ন হই, তা হলে স্বপ্নের গালিবকে নিয়ে একজন স্বপ্নের মান্টো উপন্যাস লিখতেই পারেন। এখানে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে?"[১১] অনেকটা বঙ্কিমি-ঢঙে পাঠককে শাসন করে অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাইলেন লেখক। উর্দু শিখতে এবং মন্টোর লেখা উপন্যাসটি অনুবাদের কারণে লেখক-কথক গিয়ে পৌঁছান তবসুমের কাছে। কাজ করতে করতে তিনি উপলব্ধি করেন "তবসুমের বলা মান্টোর উপন্যাসের অনুবাদ লিখতে লিখতে আমি একসময় বুঝে যাই, মির্জা গালিবকে নিয়ে আমি কখনও উপন্যাস লিখতে পারবো না। এরপর আপনারা যা পড়বেন, তা মির্জা গালিবকে নিয়ে মান্টোর উপন্যাসের অনুবাদ। মাঝে মাঝে আমি ও তবসুম ফিরে আসতেও পারি।"[১২] অবাস্তব একটি ঘটনাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে দিলেন লেখক-কথক। কেননা গালিবকে নিয়ে উপন্যাস বা দাস্তান কোনোদিনই লেখেননি মন্টো। এরপরের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে প্রধান দুই চরিত্রকে কেন্দ্র করে — মির্জা গালিব আর সদত হসন মন্টোকে ঘিরে। উপন্যাসে আরো আশ্চর্য ঘটনা হলো নিজের মৃত্যুর দিনে মন্টো তাঁর রচনা শুরু করেছেন। ভূমিকা লিখে তার নিচে যে তারিখটি মন্টো দিয়েছেন, তা ১৮-ই জানুআরি, ১৯৫৫। ওই দিনই মারা যান মন্টো। মৃত্যুর পর দোজখ্ তথা নরকের বাসিন্দা হয়ে মন্টো কথা চালিয়েছেন আর এক দোজখের বাসিন্দা মির্জা গালিবের সঙ্গো। যাঁর মৃত্যুদিন ১৫ ফেব্রুআরি, ১৮৫৯। বাস্তবে কোনোদিন দেখা না হওয়া, ভিন্নকালে বাঁচা দুটো মানুষ মৃত্যুর পর কবরে গিয়ে মুখোমুখি হয়েছেন পরস্পরের। সারা উপন্যাস জুড়ে নিজের সময়ের তথা দুটি ভিন্ন সময়ের যন্ত্রণা তাঁরা তুলে ধরেছেন পারস্পরিক কথোপকথনে। তাই তো একটা অধ্যায়ে যদি থাকে গালিব সাহেবের সময়ের অস্থিরতা, তাহলে ঠিক তার পরবর্তী অধ্যায়ে থাকে মন্টো সাহেবের সময়কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিক্ষোভ। একে 'Hallucinatory event' ছাড়া আর কী বা বলা যেতে পারে! আর গালিব বা মন্টো প্রমুখ চরিত্রগুলিও তো 'phantasmagoric' বলা যায়।

সারা উপন্যাস জুড়ে এমনই অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাকে, জাদু দুনিয়ার উপাদানকে বাস্তবের ভূমিতে স্থাপন করে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন লেখক। মার্কেজের জাদুবাস্তব গল্প 'A Very Old Man with Enormous Wings' এও দেখা যায় বাস্তবের প্রেক্ষাপটে হরেক জাদু উপাদানের ব্যবহার। তাই তো সেখানে দেবদূত নেমে আসে বাস্তবের ক্লেদাক্ত দুনিয়ায়। থাকে না তার কোনো দৈবী তথা জাদু ক্ষমতা। একটি মেয়েও বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত হয় মাকড়শায়। কিন্তু এইসবের মধ্য দিয়ে লেখক জাদু দুনিয়ার বর্ণনা দেননি বরং এলিসেন্দা, পেলাইওর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের বাস্তব লড়াইয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। রবিশংকরও 'দোজখ্নামা'য় দোজখ্ তথা নরকের বাসিন্দাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন তাঁদের সময়কালের বাস্তবকে। মির্জা গালিবের সময়কাল ১৭৯৭-১৮৬৯। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সভাকবি তিনি। হতমান মুঘল সলতনতের ক্ষয় তথা বিনাশ তখন শেষ সীমায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত করে ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি। ফলত তখন গালিবের সমস্ত রকম ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। অসহনীয় আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে শেষের দিনগুলি কাটে তাঁর। চোখের সামনে তিনি দেখেন সময়ের বদল। যে পরিবেশে, সংস্কৃতিতে তিনি বেঁচেছেন তাকে পুরো বদলে যেতে দেখেন তিনি। দেখেন ব্রিটিশ বেনিয়াদের কাছে কোনো মূল্য নেই তাঁর শিল্পীমনের, সৃজনের, কাব্যের। অনেক অনুনয় করেও ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কোনো ভাতা বা অনুদান কিছুই পান না তিনি। জীবনের এই যন্ত্রণাদগ্ধ দিনগুলির কথাই গালিব মন্টোকে বলেছেন মৃতুর পর কবরে শুয়ে। দোজখের আগুনে গালিব তো মৃত্যুর পর পোড়েননি, পুড়েছেন আগেই। পুড়েছেন রাজনৈতিক, সামজিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলের বাস্তব সময়কালে, বাস্তবের মাটিতে। যে বাস্তবে বেঁচেছেন গালিব সেটাই জ্বলন্ত দোজখ্। মন্টোর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। তাঁকেও বাঁচতে হয়েছিল দেশভাগ আর আর্থিক টানাপোড়েনের জ্বলন্ত দোজখে। 'সদত হসন মন্টো: রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থের ভূমিকায় রবিশংকর লিখছেন, "দেশভাগ তিনি মেনে নিতে পারেননি, ফলে বম্বে থেকে লাহোরে পৌঁছে

অনেকদিন মন্টো এক বিকারের মধ্যে থাকেন। নিজেই সেসব দিনের কথা লিখেছেন, "তিন মাস আমি কিছুই স্থির করে উঠতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, একটা পর্দার ওপর একই সময়ে অনেকগুলো ছবি দেখানো হচ্ছে। সব জড়িয়ে গেছে : কখনও বম্বের নানা বাজার আর রাস্তাঘাট, কখনও করাচির ছোট, দ্রুতগামী ট্রাম, আর খচ্চরে টানা দুলকি চালের গাড়ি, কখনও বা লাহোরের রেস্তোরাঁর হৈ-হট্টগোল। বুঝতে পারছিলাম না, আমি কোথায় আছি। সারাদিন চিন্তায় ডুবে আমি চেয়ারে বসে থাকতাম।'"[১৩] আর 'The Pity of Partition' গ্রন্থে Ayesha Jalal লেখেছেন — "An exploration of Manto's life and literature provides the historian with a novel way to address the complex relationship between the event and the processes of partition. Hailed as a keen observer of the moment of partition, Manto was equally, if not more power powerfully, an astute narrator of its continuing aftershocks."[১৪] আর 'দোজখ্‌নামা' উপন্যাসে কবরে শুয়ে মন্টো গল্প করতে করতে গালিবকে বলেছিলেন — "দেশভাগ আমাদের জীবনে হত্যার বীভৎস উৎসব হয়ে উঠেছিল, মির্জাসাব। শুধু তো মানুষ মানুষকে হত্যা করেনি, হত্যা করেছে পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালবাসা, নির্ভরতাকে।... দাঙ্গার আগুন এভাবেই আমাদের সব অনুভূতিকে পুড়িয়ে আঙরা বানিয়ে দিচ্ছিল।"[১৫]

'আয়নাজীবন' উপন্যাসখানি 'দোজখ্‌নামা'র দোসর বলা যেতে পারে। উপন্যাসের 'নিবেদন' অংশে রবিশংকর লিখেছেন — "'দোজখ্‌নামা' উপন্যাসের চরিত্ররা ছিল নরকের বাসিন্দা। দীর্ঘ এক দহনকাল পেরিয়ে গেছে তারা। আর এই 'আয়নাজীবন' উপন্যাসে আমরা ফিরে এলাম শুশ্রূষাময় জলের কাছে।"[১৬] এখানেও একটি 'Hallucinetary' ঘটনার মাধ্যমে লেখক উপস্থাপিত করেছেন সুফি সাধক জালালুদ্দিন রুমির বাস্তব জীবনের হাজারো কিস্‌সা। এই উপন্যাসের কথক ইবন বতুতা। তিনিই লিখেছেন জালালুদ্দিন রুমির কিস্‌সা। কাহিনির শুরুতেই কথক ইবন বতুতা জানাচ্ছেন — "আপনারা আমার এই কিতাব আগে পড়েন নি। আমার তিরিশ বছরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কেউ কেউ পড়ে থাকতে পারেন।"[১৭] মহাকালের পাঠককুলের না পড়া এই কিতাবের বিষয়বস্তু কী? শেখ ইবন বতুতা জানাচ্ছেন — "গোপন যে কিতাব আমি আজ আপনাদের সামনে পড়তে চলেছি, মওলানাই তার প্রধান চরিত্র।"[১৮] রুমিই এখানে মওলানা। আক্ষরিক অর্থেই এমন কোনো গ্রন্থ কোনোদিন লেখেননি ইবন বতুতা। রুমির কিস্‌সা শুরুর আগে দরবেশরা চারটি সন্ধ্যা জুড়ে যে গল্প ইবন বতুতাকে শোনান তাও তো জাদুবাস্তব দুনিয়ার। তাই তো গল্পকথক দরবেশ প্রথম জীবনে যখন সওদাগর ছিলেন তখন পাঁচিল থেকে ঝোলানো একটি সিন্দুকে সুন্দরী এক মেয়েকে পেয়েছিলেন আরব্যরজনীর গল্পের মেয়ে পাওয়ার মতো। ফরিউদ্দিন আতরের কাছে যে কিস্‌সা শুনতেন কিশোর রুমি তাও জাদুবাস্তব দুনিয়ার গল্প। তাই আতরের সেই কিস্‌সায় মুর্শিদ হোদহোদ পাখির সঙ্গো উড়ে যায় অনেক অনেক পাখি তাদের সুলতানের খোঁজে। সুলতান হল সিমুর্গ পাখি। তারা অর্থাৎ পাখিরা অনেক অনেক বছর ধরে উড়ে চলল। মাত্র তিরিশটি পাখি এক সময় গিয়ে পৌঁছয় কাফ পাহাড়ে জাঁহাপনা সিমুর্গের প্রাসাদে। পৌঁছে দেখে তারা মুখোমুখি হয়েছে নিজেদের আত্মার। সিমুর্গ মানেই হলো তিরিশটি পাখি। আসলে দুঃখের পথে, বেদনার পথে হেঁটে, আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই পৌঁছানো যায় আল্লাহর কাছে। এক সুফি কিস্‌সাকে (মিথ?) এভাবেই উপন্যাসে ব্যবহার করলেন রবিশংকর। আর তার সঙ্গো বলে চললেন রুমির বাস্তব জীবনের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক টানাপোড়েনকে। তাই তো ইবন বতুতার জবানীতে এখানে বর্ণিত হয় বলখ্‌ থেকে ছিন্নমূল হয়ে নিশাপুর, বাগদাদ, কোনিয়া, দামাস্কাস, আনাতোলিয়া প্রভৃতি স্থানে রুমির কখনও পিতা বাহাউদ্দিনের সঙ্গো কখনও বা একলার খণ্ড-জীবন-যাপনের বৃত্তান্ত। বাগদাদ শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় রুমিরা জানতে পারেন মোঙ্গালদের আক্রমণে ইসলামি সংস্কৃতির পীঠস্থান, 'ইসলামের গম্বুজ' বলে পরিচিত বলখ্‌ পরিণত হয়েছে শ্মশানে। বারো হাজার মসজিদ ধংস করেছে তারা। পুড়িয়েছে কোরানের চোদ্দ হাজার বই, মাদ্রাসার ছাত্র আর শিক্ষক মিলিয়ে পনেরো হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। শেখ বাহাউদ্দিন বলখের পতনের পর জালালুদ্দিন রুমিকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন — "দুনিয়ায় আর কোথাও আশ্রয় মিলবে না। আমরা উদ্বাস্তু হয়ে গেলাম, জালাল।"[১৯]

একই ধারার উপন্যাস 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে'। রবিশংকরের স্ত্রী সীমা বল জানাচ্ছেন এই গ্রন্থটি লেখার জন্য রবিশংকর প্রায় দুই লক্ষ টাকার বই কিনে ফেলেছিলেন।[২০] এটি রবিশংকরের শেষ উপন্যাস, অসম্পূর্ণও। যদিও উপন্যাসের শুরুতে, " 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে' — একটি বেদনার সিরিজ" নামক প্রাক্-কথনে লেখকের স্ত্রী সীমা বল জানিয়েছেন — "লেখা হটাৎ (যদৃচ্ছং) করে থেমে গেলেও 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে'কে অসমাপ্ত উপন্যাস বলে দেগে দেওয়া যায় না। এমনিতেও সে তো কোনদিন গোল কাহিনি রচনা করেনি।"[২১] এই উপন্যাসের কাহিনিও 'Hallucinetary event' ছাড়া আর কিছু নয়। আরব্য রজনীর সহস্রাধিক গল্প বলা শেহ্‌রজাদে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। আরব্য রজনীর কিস্‌সার জাদু দুনিয়া থেকে তিনি এসে হাজির হন ঐতিহাসিক সময়ে, বাস্তব জগতে। তাই তো উপন্যাসের শুরুতে সোফি অ্যান্ডারসনের ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি আঁকা কোনো নারীর ছবি দেখেন তিনি। দেখে মন খারাপ হয় তাঁর। Sophie Gengembre Anderson কিন্তু একজন ঐতিহাসিক চরিত্র। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জন্মানো ব্রিটিশ মহিলা চিত্রশিল্পী তিনি। দেহত্যাগ করেন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে। মূলত তিনি 'Victorian painter'. তাঁর আঁকা চিত্রগুলি বেশিরভাগই নারী, শিশু, গ্রাম্য জীবন নিয়ে। আবার কখনো শেহ্‌রজাদে সুলতান শাহ্‌রিয়ারকে একটা বইয়ের ছবির একটি পৃষ্ঠা দেখিয়ে যে কিস্‌সা শোনান, তা সিরিয়ার উদ্বাস্তুদের মৃতদেহের আখ্যান। জাদু দুনিয়ার চরিত্রগুলিকে এইভাবেই রবিশংকর এনে ফেলেছেন রূঢ় বাস্তবে। এক সময় শেহ্‌রজাদে আর তাঁর বিবিজান এসে হাজির হন বর্তমান সময়ের ভারতবর্ষের কলকাতার রাজাবাজারে। বর্তমান সময়ে প্রাচীন ভারতবর্ষকে খোঁজার চেষ্টা করেন তাঁরা। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব সময় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁদের চেতনায়, তাঁদের কিস্‌সা কথনে। পৌরাণিক ভারত, ঐতিহাসিক ভারত, বর্তমান ভারত সমান্তরালে চলে তাঁদের কিস্‌সায়। 'মহাভারত', 'বিষ্ণুপুরাণ', মনুর 'ধর্মশাস্ত্র'র বৃত্তাকার সময় চেতনাকে স্বীকৃতি জানিয়ে বিবিজান শেহ্‌রজাদে স্বামী সুলতান শাহ্‌রিয়ারকে বলেন কলিযুগে দেশভাগ ভারতবর্ষের ভবিতব্য — "কলিযুগেই ভারতবর্ষ ভেঙে প্রথমে দুটুকরো হয়ে যায়, মালিক : ভারত ও পাকিস্তান। তারপর পাকিস্তান থেকে জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এই দেশ আরও কত টুকরো হবে, ভেঙে যাবে, আমরা জানি না।"[২২] জাদু বাস্তবতার তত্ত্ব অনুসারে একে 'Hybridity' বলা যেতে পারে। আন্তর্জাল সূত্র 'Wikipedia'তে 'Hybridity' প্রসঙ্গে Danial, A. Lee র বক্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধার করে বলা হয়েছে "Magical realism plot lines characteristically employ hybrid multiple planes of reality that take place in 'inharmonious arenas of such opposites as urban and rural, and Western and indigenous.'"[২৩] ঠিক একই রকমভাবে সিন্দবাদ হয়ে ওঠে উপন্যাসের একটি চরিত্র। আরব্য রজনীর মিথিক্যাল দুনিয়া থেকে সে চলে এসেছে একবিংশ শতকের বাস্তবের কলকাতায়। মার্কেজের গল্পেও দেবদূত এসে পৌঁছেছিল লাতিন আমেরিকার দারিদ্র্যময় জীবনের রূঢ় বাস্তবে। তাই তো রঘুপতি তাকে পাকড়াও করে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনার বাসনা প্রকাশ করলে মৃত্তিকা বলে, "সে তো বলে, গল্প জানে না। গল্প শোনাই তার কাজ। সে নাকি গরিব সিন্দবাদ। কুলির কাজ করে। বড়লোক, নাবিক সিন্দবাদ তাকে গল্প শোনায়। ভাল ভাল খাবার, মদ খাবে, আরাম করবে বলে সে ধনী সিন্দবাদের গল্প শুনতে যায়। নাবিক সিন্দবাদও তাকে ছাড়তে চায় না।"[২৪] এই রকম বহুবিধ কিস্‌সার মধ্য দিয়ে লেখক পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরেছেন বর্তমান ও ঐতিহাসিক ভারত তথা বিশ্বের নানাবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক রূঢ় চিত্রকে। সেই কারণে উপন্যাসে সিরিয়া-লেবাননের উদ্বাস্তুদের কথা যেমন আসে, তেমনি আসে স্বাধীনতার সময় ভারতের বাঁটোয়ারার কারণে গান্ধীজির অন্তর্বেদনার চিত্র। এই বিষয় সম্পর্কে রঘুপতির মন্তব্য — "এই ঘটনার কোনো নাটকীয় গল্প তৈরি করা যায় না। তাহলেই ভেঙে পড়বে এই উপমহাদেশের বাস্তবতা — স্বাধীনতা, দেশভাগ — আর মানুষ গান্ধীজির বাস্তবতা। ধারাবাহিক, চমকদার গল্প নয়, তুমি একে খণ্ড বৈচিত্রের মহিমা দাও।"[২৫] এই রচনাতেও শেহ্‌রজাদে, শাহ্‌রিয়ার, সিন্দবাদ প্রমুখ চরিত্রগুলি 'phantasmagoric'.

আবার 'জিরো আওয়ার' নভেল্লাতে কবি অমলকান্তি বন্দ্যঘাটীর যে আখ্যান বর্ণনা করেছেন কবি সেখানেও লক্ষ করা যায় বেশকিছু 'Hallucinatory' ঘটনা। তাই তো তাঁর জীবনে আসে কখনো নবারুণ ভট্টাচার্যের সাহিত্য দুনিয়ার পুরন্দর ভাট, কখনো বা অ্যালেবার কামু। কখনো আবার জীবনানন্দের মাল্যবানের

সঙ্গো কথোপকথন চলে গ্রীক পুরাণের ইউলিসিসের। কিন্তু এইসবের মধ্য দিয়ে রবিশংকর আসলে বর্ণনা করেছেন বর্তমান বিশ্বের আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক সমস্যার কথা। আমেরিকার সন্ত্রাসবাদ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের স্পষ্ট চিত্র লেখক তুলে ধরেন উপন্যাসে — "১৯৮৫তে রোম ও ভিয়েনা এয়ারপোর্টে লিবিয়ার প্ররোচনায় যে আক্রমণ চালানো হয়েছিল, আমেরিকার মতে তা সন্ত্রাসবাদ। অন্যদিকে ১৯৮৬তে লিবিয়াতে যে শাস্তিমূলক হানাদারি আমেরিকা চালিয়েছিল, কর্নেল মুয়াম্মর গদ্দাফি তাকেই সন্ত্রাসবাদ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে রোম ও ভিয়েনা এয়ারপোর্টে আক্রমণ এক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, স্বাধীনতার লড়াই।"[২৬] তাহলে কোন্‌টা সন্ত্রাসবাদ? পশ্চিমের দেশগুলির সংজ্ঞায় যা সন্ত্রাসবাদ তা সিরিয়া, লিবিয়া, ইরান-সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশের কাছে স্বাধীনতার লড়াই। তাই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা দিয়ে রবিশংকর লিখেছেন — "আমাদের কাছে সন্ত্রাসবাদীর সংজ্ঞা একটাই : নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে সে যে কাউকে মারতে পারে, নারী-শিশু-বৃদ্ধ-অক্ষম কেউই তার নিশানার বাইরে নেই।"[২৭] সব মিলিয়ে নভেলাটিতে লেখক এইভাবেই নির্মাণ করেছেন জাদুবাস্তব দুনিয়া।

জাদুবাস্তবতা আসলে এক বিশেষ প্রকারের কথনরীতি। যে কথনরীতি সম্পর্কে Maggie Ann Bowers জানিয়েছেন — "The characteristic of magical realism which makes it such a frequently adopted narrative mode is its inherent transgressive and subversive qualities. It is this feature that has led many postcolonial, feminist and cross-cultural writers to embrace it as a means of expressing their ideas."[২৮] তাই তো জাদুবাস্তব রচনায় লক্ষ করা যায় 'heteroglossia', 'cross-culturalism', 'postmodernism', এবং 'postcolonialism' বিষয়গুলি। রবিশংকরের উক্ত চারখানি উপন্যাসের কথনরীতিতে প্রায় সবকটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়। 'দোজখ্‌নামা', 'আয়নাজীবন', 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে' উপন্যাস তিনটিতে রবিশংকর সরাসরি প্রচলিত গল্প বলার তথা ইউরোপীয় গল্প বলার রীতি থেকে সরে এসেছেন। মধ্য-এশীয় কিস্‌সা, দাস্তান বলার ধরণকে অনুসরণ করেছেন তিনি। যে কথনের ধরণে আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত নিটোল গল্প তৈরি হয় না কোনোদিন। কথা যেন এখানে ফুরায় না। গল্পের ভিতরে গল্পের এক অনিঃশেষ যাত্রা চলতে থাকে। আমাদের দেশীয় কথকতার ধরণও অনেক দূর পর্যন্ত এই রকম। 'ঠাকুমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'পঞ্চতন্ত্র', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ইত্যাদি রচনায় এই রীতি লক্ষণীয়। 'মহাভারতে'ও তো আছে কথকতার রীতি। এই প্রসঙ্গো রবিশংকরের কিছু কথা উদ্ধৃতিযোগ্য — "নতুন কথা বলে সাহেবরা, যারা সবসময় আমাদের চমকে দিতে চায়। আমরা জানি, একটি কথাকে ঘিরে সাতকাহন বাড়ে শুধু। এর বেশি কিছু নয়। একটি আদিকাহিনি। সাপটি তার লেজ থেকে নিজেকেই খাচ্ছে আর এই খাওয়া কখনও শেষ হয় না। সব গল্প এই আদিকাহিনিকে ঘিরে নানারকম বুনন আর কী।"

ছটোবেলায় দিদিমার কাছে শুয়ে অনেক গল্প শুনতাম। আমার বেশ মনে আছে, একটি গল্প — হয়তো তা লেবুসুন্দরীর — এক একদিন এক একরম ভাবে বদলে যেত, আমি না ঘুমনো পর্যন্ত একই গল্পে নানা ঘটনা জুড়ে দিত দিদিমা। অর্থাৎ লেবুসুন্দরীরই নানারকম গল্প। আসলে পুরোটাই একটা নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাওয়া। আপনি যেখানে থামলেন, গল্প সেখানেই শেষ; আবার চলতে শুরু করলে গল্প শুরু হয়।"[২৯] কথনের ক্ষেত্রে এই বিশেষ রীতির ব্যবহারকে 'postcolonialism' ছাড়া আর কী বা বলা যেতে পারে! আর 'জিরো আওয়ার' উপন্যাসে তো কামুর সঙ্গো অমলকান্তির আচরণে, কথোপকথনে সরাসরি 'কলোনিয়ালিজম'এর বিরুদ্ধতা করেছেন লেখক। রাতের অন্ধকারে অমলকান্তি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিতে বৃষ্টি দেখতে দেখতে আর ব্যাঙের ডাক শুনতে শুনতে হঠাৎ কামুর ভূতকে দেখতে পায়। অমলকান্তি ভূত কামুকে দেখে দুই হাত জড়ো করে প্রণাম করতে করতে উঠে দাঁড়ায়। কামু বসতে বললেও অমলকান্তি বসে না। তাতে কামুর প্রতিক্রিয়া — "এখনও কলোনিয়ালিজম ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না? সাদা চামড়া দেখলেই উঠে দাঁড়ান?"[৩০] উত্তরে অমলকান্তি বলে — "সরি স্যর"। এবারও কামুর প্রতিক্রিয়া — "আবার কলোনিয়াল হ্যাং ওভার! ওপারে — বুঝলেন — বাংলাভাষার চারজন লেখকের সঙ্গো মারতে খুব ভাল লাগে।"[৩১]

সেই চারজন হলেন জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। কী আশ্চর্য ম্যাজিক রিয়ালিস্ট ভাবনা রবিশংকরের!

আর 'heteroglossia' সম্পর্কে 'merriam-webster'এ বলা হয়েছে "a diversity of voices, styles of discourse, or point of view in a literary work and especially a novel."[৩২] 'দোজখ্‌নামা'য় স্বরের বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য। মির্জা গালিব, মন্টো আর উপন্যাসের উত্তম পুরুষ কথক এই তিনজনের স্বরই স্পষ্ট বৈচিত্র্যে এখানে বিদ্যমান। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যও উপন্যাসে স্পষ্ট। গালিব যে কালের ভারত-দর্শনের কথা বলে, মন্টো বলে অন্যকালের ভারত-দর্শনের কথা। উত্তম পুরুষ কথক আবার ভিন্নকালের ভারতকে তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। আবার সময়ের সরলরৈখিক ক্রমও এখানে অনুসরণ করেননি লেখক। ভিন্ন ভিন্ন সময় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এখানে। তাইতো মির্জা গালিবের কুকুর 'মহাভারতে'র কুকুরের মতো ধর্মরাজ হয়ে গালিবকে শোনাতে পারে অনেক পরের কবি শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা'। জাদুবাস্তব কথনে এসবই সম্ভব।

'আয়নাজীবন', 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে', বা 'জিরো আওয়ার'এও লক্ষ করা যায় একাধিক কথকের স্বরের বৈচিত্র্য, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য। 'আয়নাজীবন'এ ইবন বতুতাই একমাত্র কথক নন। চারজন দরবেশও হয়েছেন এখানে এক এক রাতের কিস্‌সার কথক। আর 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে'তে কিস্‌সার কথক একাধারে শেহ্‌রজাদে, শাহরিয়ার, সিন্দবাদ, রঘুপতি প্রমুখ। কালানুক্রমিক সময় চেতনা এখানেও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 'জিরো আওয়ার'এও একই ধরণ লক্ষ করা যায়। এখানে অমলকান্তি, কামু, পুরন্দর ভাট, মাল্যবান, ইউলিসিস প্রমুখ চলে আসে একই সময়ের বৃত্তে। দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য নিয়ে প্রত্যেকেই স্বর বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছে এখানে।

এবার আসা যাক 'cross-culture'এর প্রসঙ্গে। সাহিত্যে 'cross-culture'এর প্রয়োগ বলতে বোঝায় একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে একাধিক সংস্কৃতির উপস্থাপনা। আফগানি-আমেরিকান লেখক খালেদ হোসেইনির 'Kite Runner' উপন্যাসে, সালমান রুশদের 'Fury' প্রমুখের উপন্যাসে বিষয়টির যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করা যায় বলে তাত্ত্বিকদের অভিমত। খালেদ হোসেইনির উপন্যাসে লক্ষ করা যায় দুই ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি থেকে আসা মানুষের হৃদয়স্পর্শী বন্ধুত্বের গল্প। দোজখ্ এ দেখা হয়ে হৃদয় উজার করে গল্প করা গালিব আর মন্টোও ভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতির মানুষ। 'জিরো আওয়ার' উপন্যাসে কথোপকথনরত অমলকান্তি-কাফকা, মাল্যবান-ইউলিসিস ভিন্ন সংস্কৃতির কথাই তুলে ধরেছে পাঠকের সামনে। অন্যদিকে 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে'তে আরব্য রজনীর শেহ্‌রজাদে-শাহ্‌রিয়ার আর বাস্তবের রঘুপতি ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক বাহক। তাছাড়াও হিন্দু আর ইসলাম উভয় সংস্কৃতির কথাই আছে এখানে। সিন্দবাদ যেমন এখানে আছে তেমনি আছে শ্বেতকেতু, আরুনি। আরো আছে বর্তমান পৃথিবীর হিংস্র রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা।

এই সমস্তকিছু নিয়েই তো নির্মিত হয় পোস্টমর্ডানিস্ট সাহিত্য। পোস্টমর্ডান সাহিত্যের কথনের অন্যতম লক্ষণগুলি হলো — আকস্মিকতা, সচেতনভাবে যুক্তি ভাঙা, আপাত অর্থহীনতা, ইতিহাসের সময়ের ক্রম রক্ষা না করা, বিনির্মাণ, কাহিনিতে ধারাবাহিকতার অভাব, উদ্দেশ্যহীনতায় কাহিনির যাত্রা, উপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হওয়া তথা কলোনিয়াল হ্যাংওভার কাটিয়ে ওঠা ইত্যাদি। আর রবিশংকর এইসব কিছু নিয়েই নির্মাণ করে চলেন অনিঃশেষ গল্প। যে গল্পের কথনে মিশে আছে দেশীয় কথকতার ধরণ, মিশে আছে মধ্য এশিয় কিস্‌সা কথনের ধরণ। তাই নিটোল গল্প রবিশংকরের অধিকাংশ উপন্যাসে খুঁজে পাবেন না পাঠক। জাদুবাস্তব কথনে ছোটো ছোটো কিস্‌সার মধ্য দিয়ে রবিশংকর আসলে পাঠককে হাত ধরে নিয়ে যান — না ফুরানো গল্পের দিকে...

তথ্যসূত্র :

১. রবিশংকর বল, 'গদ্যসংগ্রহ ১', 'বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব'; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০২২, পৃ. ৩৭২

২. Roh Franz; 'Magic Realism: Post-Expressionism'; 'Magical Realism'; Edited with an Introduction by Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris; Duke University Press; Fourth printing; 2003; p.15.

৩. Carpenter Alejo; 'On the Marvelous Real in America', 'Magical Realism'; Edited with an Introduction by Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris; Duke University Press; Fourth printing; 2003; p. 84.

৪. Carpenter Alejo; 'On the Marvelous Real in America', 'Magical Realism'; Edited with an Introduction by Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris; Duke University Press; Fourth printing; 2003; p. 87.

৫. Gabriel Garcia Marquez – 'Nobel Lecture.' --- www.nobelprize.org

৬. Magical Realism; 'Introduction: Daiquiri Birds and Flaubertian Parrot(ie)s'; Edited with an Introduction by Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris; Duke University Press; Fourth printing; 2003; p. 6.

৭. Bowers Maggie Ann; 'Magi(al) Realism; Routledge; London and New york'; First Indian Reprint 2007; p. 21.

৮. Ibid.

৯. রবিশংকর 'দোজখ্‌নামা' উপন্যাসে 'মান্টো' শব্দটি ব্যবহার করলেও পরে মন্টোর অনূদিত রচনাসংগ্রহের ভূমিকায় তিনি 'মন্টো' শব্দটি ব্যবহার করেন। হিন্দি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলিতেও 'মন্টো' বানান তথা শব্দটি গৃহীত হয়েছে। উর্দুতেও উচ্চারণ 'মন্টো'। তাই 'মন্টো' বনানটাই এখানে গ্রহণ করা হলো। অন্যদিকে রামকুমার মুখোপাধ্যায় 'দোজখ্‌নামা'র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'দেশকালের সন্ধানে দুটি চরিত্র'এ (গদ্য সংগ্রহ, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩০২) 'মান্টু' বানানটি লিখেছেন। তাঁর মতে কাশ্মীরি 'মিন্ট' শব্দ থেকে 'মান্টু' শব্দটি আগত। 'মিন্ট' শব্দের অর্থ 'বাটখারা'।

১০. রবিশংকর বল, 'দোজখনামা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৯

১১. ওই, পৃ. ১৪

১২. ওই, পৃ. ১৮

১৩. রবিশংকর বল সম্পাদিত, 'সদত হসন মন্টো: রচনা সংগ্রহ'; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৮

১৪. Jalal Ayesha; 'The Pity of Partition; Princeton University Press'; Princeton and Oxford; 2013; p. 148

১৫. রবিশংকর বল, 'দোজখনামা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৩৪৭

১৬. রবিশংকর বল, 'আয়নাজীবন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ৭

১৭. ওই, পৃ. ১১

১৮. ওই, পৃ. ১১

১৯. ওই, পৃ. ৮৩

২০. রবিশংকর বল, 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৯

২১. রবিশংকর বল, 'কিস্‌সা বলেন শেহ্‌রজাদে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১৫ ২২ . ওই, পৃ. ৩১

২৩. wikipedia.org (Magic Realism)

২৪. ওই, পৃ. ৬৭

২৫. ওই, পৃ. ৭১

২৬. রবিশংকর বল, ‘জিরো আওয়ার’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০১৫, পৃ. ২৩
২৭. ওই, পৃ. ২৪
২৮. Bowers Maggie Ann; ‘Magi(al) Realism; Routledge; London and New york’; First Indian Reprint 2007; pp. 65-66.
২৯. রবিশংকর বল, ‘গদ্যসংগ্রহ ১’, ‘প্লট ভাঙো, গল্প লেখো’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০২২, পৃ. ১৯৮
৩০. রবিশংকর বল, ‘জিরো আওয়ার’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০১৫, পৃ. ৩৪
৩১. ওই, পৃ. ৩৪
৩২. www.merriam-webstar.com

লেখক পরিচিতি : দিব্যেন্দু সরকার, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়, পিএইচ.ডি গবেষক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।